Name of the teacher : DIPANNITA KUNDU

Department : Political Science

Caption : Nehru : Views on Socialism and Democracy

Sem - IV - PLSA - CC - 8

কমিউনিজমের প্রতি উৎসাহ দেখালেও, বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের চেয়ে গণতান্ত্রিক সমাজবাদের দৃষ্টিতেই তিনি আচ্ছন্ন ছিলেন বেশী। গান্ধীর মতই ছিল তাঁর অকপট স্বীকারোক্তি। 'An Autobiography' -তে তিনি বলেছেন 'My politics had been those of my class, the bourgeoisie."[১] তিনি স্বীকার করেছেন, ১৯২০ সালেও তিনি জানেন না দেশের শ্রমিক ও কৃষকদের অবস্থা কেমন! তবে দারিদ্র্যের সমস্যা, রাজনৈতিক স্বাধীনতার প্রশ্ন নিয়ে তিনি যে চিন্তিত এই আভাষ তিনি দেন। নেহরুর সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব হল জাতীয় কংগ্রেসের প্রতি তাঁর প্রবল আনুগত্য। কংগ্রেস কার্যকরী সমিতির (Working Committee) প্রতিটি সিদ্ধান্তকেই তিনি সঠিক সিদ্ধান্ত বলেই মেনেছেন। গান্ধীর সঙ্গে তাঁর মতবিরোধ ছিল, কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থী নেতৃত্বের সঙ্গে তার মতানৈক্য ছিল, কিন্তু কংগ্রেস সংগঠনের মধ্যে থেকেই দলের প্রতি আনুগত্য বজায় রেখেই তিনি এঁদের জয় করবার চেষ্টা করেছেন। করাচী কংগ্রেস (১৯৩১), লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসে (১৯৩৬) তাঁর প্রগতিশীল ভূমিকা, পরিকল্পিত অর্থনীতির ধারায় ভারতের সমাজ গঠন কার্যে তাঁর উদ্যোগ, জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের প্রবক্তা হিসাবে এবং আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তার অগ্রদূত হিসাবে তাঁর অবদান নেহরুর বিশিষ্টতাকে প্রমাণ করে। ভারতীয় সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও জাতিগঠনের যে মডেল নেহরু উপস্থিত করেছেন কেবলমাত্র তার বিচারেই গবেষক মহলে তিনি বিখ্যাত।

ক. নেহরুর রাজনৈতিক চিন্তার মতাদর্শগত ও দার্শনিক ভিত্তি

রাজনৈতিক চিন্তায় নেহরুর অবদান বিচার করার ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম যে বিষয়টি গবেষক মহলে গুরুত্ব লাভ করে সেটি হল তাঁর চিন্তার দার্শনিক ও মতাদর্শগত ভিত্তি। নেহেরু নিজেই বলেছেন আমরা দার্শনিক নই, কিন্তু দার্শনিক ও মতাদর্শগত দৃষ্টিভংগি ছাড়া কোন কিছুকে বিচার করা সম্ভব নয়। নেহরুর রাজনৈতিক চিন্তা তাঁর দার্শনিক ও মতাদর্শগত দৃষ্টিভংগিকে ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছে। তাঁর দার্শনিক বোধ বা উপলব্ধি স্পষ্ট না হলেও, বিচ্ছিন্ন, অসঙ্গত হলেও তাকে সংযুক্ত করার একটা প্রচেষ্টা তাঁর ছিল। গান্ধীর মতই ভারতীয় দর্শনের মূল কথা সত্যকে তিনি নিরীক্ষণ করতে চেয়েছেন তাঁর রাজনৈতিক ভাবনায় ও কর্মে। হিন্দু ভাবনা 'সহাবস্থান ও সমন্বয়ে' তাঁর প্রবল বিশ্বাস ছিল। তিনি বৈচিত্র্য, বিরোধিতার মধ্যেই ঐক্যের সন্ধান করেছেন। বিপরীত মতাদর্শ, রাজনৈতিক সংঘাত ও বিরোধকে তিনি অস্বীকার করেন না, কিন্তু এদের মধ্যে ঐক্য সূত্রটিকেও তিনি সন্ধান করেন। জওহরলাল মতাদর্শগত কঠোরতায় বিশ্বাসী ছিলেন না। সমস্যাকে তিনি বুঝতে চেয়েছেন—ব্যক্তির, সমাজ, জাতির সমস্যা। বৈজ্ঞানিক যুক্তি তাঁর চিন্তাকে প্রভাবিত করেছে। রাজনীতির চিন্তায় ধর্মের প্রভাবকে তিনি মানতে চান নি। ধর্মের প্রভাবকে অস্বীকার করলেও রাজনীতিতে নীতিবোধের স্থানকে তিনি অস্বীকার করেন নি। বাস্তববাদী হলেও ভারতীয় ঐতিহ্য, আদর্শের প্রতি তাঁর অনুরাগ ছিল। এই আদর্শকে রাজনীতিতে স্থাপন করতে তাঁর দ্বিধা ছিল না।

'Glimpses of World History' 'The Discovery of India'—নেহরুর স্বচ্ছ ইতিহাস

১. Jawaharlal Nehru, An Autobiography, p 48.

চেতনার প্রকাশ। ইতিহাসকে কখনই তিনি ঘটনার বিবরণ হিসাবে দেখেন নি, দেখেছেন সমাজ বিকাশের ধারা হিসাবে। ইতিহাসের প্রতিটি পর্বেই তিনি সন্ধান করেছেন পরিবর্তন আর প্রগতিকে। ইতিহাসে জনগণের স্থান কী, ইতিহাসের অর্থনৈতিক উপাদান কী, ইতিহাসের শ্রেণীগত অবস্থান কী সব কিছুকেই নেহরু সন্ধান করেছেন। ইতিহাসের বস্তুবাদী দৃষ্টি দিয়েই তিনি বিচার করেছেন ভারতবর্ষের ইতিহাসের গতি, পৃথিবীর ইতিহাস, সমাজ-ব্যবস্থা, রাষ্ট্রব্যবস্থা সব কিছুকেই। পুঁজিবাদ, সাম্রাজ্যবাদ, ফ্যাসিবাদ, গণতন্ত্র, সমাজবাদ, জাতীয়তাবাদ, আন্তর্জাতিকতা সব কিছুর ব্যাখ্যায় ইতিহাসের বস্তুবাদী দৃষ্টিকে তিনি প্রয়োগ করেছেন। ভারতের সামাজিক-আর্থিক পরিস্থিতি, আর্থিক-রাজনৈতিক সংকট, জাতীয়তাবাদী আন্দোলন, স্বাধীনতা, সামাজিক-আর্থিক পরিবর্তনের ব্যাখ্যায় তিনি প্রয়োগ করেছেন তাঁর বস্তুবাদী চিন্তাকে।

নেহরুর চিন্তার একটি বলিষ্ঠ দিক হল তাঁর মানবিক বোধ। এই মানবিক বোধ দিয়ে তিনি পর্যবেক্ষণ করেছেন সভ্যতা, সংস্কৃতি, শান্তি, সংহতির প্রশ্নকে। সভ্যতার সংকটের মূল হিসাবে রাজনৈতিক ও আর্থিক কারণকে নির্দেশ করলেও মানবিক শক্তির অবক্ষয়কেই তিনি প্রধান সংকট বলে নির্দেশ করেছেন। কাজ, সহযোগিতা, ঐক্য, ভ্রাতৃত্ব, সমতার আদর্শকে এই সংকট মোচনের সমাধান হিসাবে পেশ করেন তিনি।

নেহরুর মতাদর্শগত ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে নানা সূত্র ধরে। এর মধ্যে প্রধান হল ফ্যাবিয়ান মতবাদ, মার্কসবাদ ও গান্ধীবাদ। কোন কোন লেখক মনে করেন নেহরুর চিন্তায় উনবিংশ শতকের মানবিক উদারবাদের সঙ্গে গণতান্ত্রিক সমাজবাদ মিশেছে। নেহরুর ভাবনায় একই সঙ্গে বুর্জোয়া মতবাদ, মার্কসবাদ, উদারবাদ, সমাজতন্ত্রবাদ, গান্ধীবাদ পাশাপাশি অবস্থান করে বলে অনেকে মনে করেন। তবে সব কিছুর উপরে যুক্তিবাদ ও প্রয়োগবাদের ছাপই তাঁর চিন্তায় বেশী। নেহরুর রাজনৈতিক ভাবনার পেছনে আইনজ্ঞ, অর্থনীতিবিদ, ইতিহাসবিদ, মনোবিদ, সমাজতাত্ত্বিক এবং সর্বোপরি বিজ্ঞানীর অভিজ্ঞ ও বিশ্লেষণমূলক দৃষ্টি কাজ করেছে বলে অনেক লেখক মনে করেন। নেহরুর চিন্তায় ভারতবোধের সঙ্গে বিশ্ববোধের সমন্বয় ঘটেছে বলেও কেউ কেউ মনে করেন। নেহরুর গঠনমূলক সৃজনশীল দৃষ্টিভংগির দিকে কেউ কেউ দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তবে কোন মতবাদের প্রতিই তাঁর স্থির বিশ্বাস বা অটুট আনুগত্য শেষ পর্যন্ত ধরা পড়েনি। প্রতিটি আদর্শকেই তিনি গ্রহণ করেছেন এবং প্রয়োজনমত সংশোধন করেছেন। নিজের ভাবনাকেও নতুন অভিজ্ঞতার আলোকে সংশোধন করেছেন তিনি। কোন ধারাবাহিক পদ্ধতি মেনে তিনি চলেন নি। সমালোচকেরা মনে করেন চিন্তার সমন্বয় নয়, বোঝাপড়াই ছিল নেহরুর বৈশিষ্ট্য। যখন যে মতাদর্শকে তিনি প্রবল মনে করেছেন সেই মতাদর্শের দিকে তিনি ঝুঁকেছেন। রাজনৈতিক ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে, শাসনাধিকার পেয়ে নেহরুর নরমপন্থা ও বোঝাপড়ার নীতি আরও প্রকট হয়েছে বলে অভিযোগ।

খ. নেহরু ও জাতীয়তাবাদ

জাতীয়তাবাদী ঐতিহ্যেই নেহরুর রাজনৈতিক ভাবনা বিকশিত হয়েছে। যে সময়ে নেহরু তাঁর রাজনৈতিক ভাবনাকে প্রস্তুত করছেন সেই সময়টি জাতীয় আন্দোলনের যুগ। 'Discovery

of India' গ্রন্থে নেহরু বলেছেন, '.....Nationalism was and is inevitable in the India of my day.....for any subject country national freedom must be the first and dominant urge; for India, with her intense sense of individuality and a past heritage, it was doubly so.' 'An Autobiography'র লেখক নেহরু লিখেছেন কেমনভাবে জাতীয় আন্দোলনের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়েছে ভারতবর্ষে, কিভাবে জাতীয় আন্দোলনের এই বৃত্তে তিনি নিজেকে জড়িয়ে ফেলেছেন। হ্যারো ও কেম্ব্রিজের ছাত্রজীবনেই ভারতের জাতীয় আন্দোলন ও আন্দোলনের নেতাদের সঙ্গে নেহরু পরিচিত হয়েছেন। মতিলাল নেহরু, বালগঙ্গাধর তিলক, গান্ধীজি সকলেই কমবেশী নেহরুর জাতীয়তাবাদী ভাবনাকে প্রভাবিত করেছেন। ইউরোপ ভ্রমণের সূত্রে এবং কংগ্রেস সংগঠনে কাজ করার অভিজ্ঞতায় জাতীয় আন্দোলনের তত্ত্ব ও কর্মপদ্ধতি সম্পর্কেও তাঁর জ্ঞান হয়েছে। তবে অন্যান্যদের মধ্যে জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে যে আবেগ ছিল নেহরুর তেমনটা ছিল না। পুঁজিবাদ, সাম্রাজ্যবাদ, ঔপনিবেশিক প্রশ্ন, সমাজতন্ত্র ইত্যাদি ধারণার প্রেক্ষাপটেই জাতীয়তাবাদের তাত্ত্বিক প্রশ্নকে তিনি বিচার করেছেন। জাতীয়তাবাদকে নিপীড়িত জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার হিসাবে সরলভাবে তিনি দেখেন নি। জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টি ছিল একাধারে সমালোচকের দৃষ্টি ও সমাজতান্ত্রিক দৃষ্টি। জাতীয়তাবাদের সঙ্গে আন্তর্জাতিক প্রশ্নটিকেই তিনি বিচার করেছেন। নেহরুকে বলা হয় আলোকিত জাতীয়তাবাদী। জাতীয়তাবাদের মধ্যে ধর্মীয় বিশ্বাস, সংকীর্ণ অন্ধ আবেগকে তিনি দেখেন নি, জাতীয়বাদকে তিনি দেখেছেন বিশেষ সামাজিক-আর্থিক পরিস্থিতি ও ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে। জাতীয়তাবাদের সঙ্গে তিনি জুড়ে দিয়েছেন মানবতাবাদী ও সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের এক ভাবনা।

জাতীয়তাবাদের সংকীর্ণ ধারণা পুঁজিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের হাত শক্ত করে, সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদ আক্রমণাত্মক, বিভেদপন্থী, জাতিগত বিদ্বেষ ও অসহিষ্ণুতার প্রকাশ একথা বার বার বললেও নেহরু জাতীয়তাবাদকে বা এর শক্তিকে অস্বীকার করেন নি। জাতীয়তাবাদ উপেক্ষার বস্তু নয়। সংকটের সময়ে এই শক্তি আবির্ভূত হয়, আধিপত্য করে, শান্তি ও মানবতার পথে বাধা সৃষ্টি করে একথা সত্য হলেও এটাও সত্য নিপীড়িত জাতির জাতীয়তাবাদ স্বাধীনতা ও প্রগতির অনুকূল এবং সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলন হিসাবে সমর্থন-যোগ্য। ভারতবর্ষে জাতীয়তাবাদকে তিনি পূর্ণ স্বাধীনতার, সম্পূর্ণ স্বরাজের আন্দোলন হিসাবেই দেখেছেন। ভারতের জাতীয়তাবাদের বহুমুখী অবস্থান, শ্রেণীগত অসঙ্গতির সমস্যাকে জেনেও নেহরু ভারতের জাতীয় আন্দোলনকে সমর্থন করেন এই কারণেই যে পূর্ণ স্বাধীনতালাভের প্রশ্নে এর আবেদন অনস্বীকার্য। নেতিবাচক প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে গঠনমূলক শক্তি নিয়েই ভারতে জাতীয়তাবাদ তার ভূমিকা পালন করবে এবং এ ব্যাপারে জাতীয় কংগ্রেসের যে একটা ইতিবাচক ভূমিকা আছে একথা নেহরু স্বীকার করেন। গান্ধীজির জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিকে নেহরু স্বাগত জানিয়েছেন এই কারণে যে গান্ধীজি ভারতের জাতীয়তাবাদকে, 'selfless struggle of her people' বলেই

১. Nehru, Discovery of India, p 52

বিচার করেন, এই জাতীয়তাবাদে কোন সংকীর্ণতা নেই এবং এই জাতীয়তাবাদ আন্তর্জাতিকতার পরিপূরক। ভারতের জাতীয়তাবাদের সঙ্গে ধর্মনিরপেক্ষতা, সম্পূর্ণ স্বাধীনতা, আর্থিক সমতা, আর্ন্তজাতিকতার প্রশ্নকে যুক্ত করেছেন তিনি। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে, পূর্ণ স্বরাজের পক্ষে এই আন্দোলন অপরিহার্য বলেই তিনি মনে করেন। লাহোর কংগ্রেস, লক্ষ্ণৌ কংগ্রেস, বিভিন্ন আলোচনা, বক্তৃতা, রচনায় নেহরু ভারতের জাতীয়তাবাদকে পূর্ণ স্বাধীনতার অনুকূল শক্তি হিসাবেই সমর্থন করেছেন। ভারতের জাতীয়তাবাদের সঙ্গে সাম্প্রদায়িকতা, বিচ্ছিন্নতা, বৈষম্য যুক্ত নয়, এদেশের জাতীয়তাবাদ অখণ্ড জাতীয়তাবাদ, দেশের জাতীয় ঐতিহ্য ও অভিজ্ঞতার ধারায় পুষ্ট বলেই তিনি মনে করেন।[১]

নেহরুর জাতীয়তাবাদী ভাবনা ইতিবাচক রূপ নেয় তাঁর জাতি গঠনের, আধুনিক ভারত গঠনের বিশাল কর্মযজ্ঞে। স্বাধীন ভারতের প্রধান মন্ত্রী হিসাবে জাতি গঠন ও নির্মাণের যে পরিকল্পনা তিনি পেশ করেছেন তার আবেদন অসামান্য। ভারতের সমাজব্যবস্থার অবক্ষয়ের দিকে লক্ষ্য রেখে জাতিগঠনের কাজ শুরু করতে হবে একদম মূল থেকে নেহরু এই বিশ্বাস নিয়ে দেশের সংস্কার ও নির্মাণকার্যের কথা ভেবেছেন। 'Discovery of India' গ্রন্থে তিনি জানিয়েছেন ভারতবর্ষ তাঁর রক্তে, এর এমন অনেক কিছু আছে যা তাঁকে সহজাতভাবেই রোমাঞ্চিত করে। তবুও ভারতবর্ষকে তিনি একজন বিদেশী সমালোচকের মত অপছন্দ নিয়ে দেখতে চান, তিনি এর দৃষ্টিভংগি, অবস্থানকে বদলে ফেলতে চান, দিতে চান এর মধ্যে আধুনিকতার ছোঁয়া। ভারতের অনেক কিছুকেই তিনি ছেঁটে ফেলতে চান, তবে ভারতবর্ষকে ভালভাবে না জেনে নয়। এর নিশ্চয়ই এমন কিছু আছে যার গুণে হাজার হাজার বছর ধরে সে তার সাংস্কৃতিক অস্তিত্বকে বজায় রাখতে পেরেছে। ভারতের রূপান্তর ঘটাবার আগে, ভারতকে আধুনিক করার আগে ভারতকে যে জানতে হবে, আবিষ্কার করতে হবে তাঁর আত্মাকে নেহরু এটা বুঝেছেন। ভারতের ইতিহাস ও সমাজ সম্পর্কে তিনি তেমন আশাবাদী নন। তিনি গ্রহণ করেছেন ভারত গঠনের রাষ্ট্রিক মডেল।[২] পার্লামেন্ট, ক্যাবিনেট, কংগ্রেস পার্টি আর আমলাতন্ত্রকে তিনি বিন্যস্ত করতে চেয়েছেন।

গ. নেহরুর ভারত গঠন কার্য ও রাষ্ট্র ধারণা

ভারতের পার্লামেন্টীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে সংগঠিত করার লক্ষ্য নিয়ে নেহরু পার্লামেন্টীয় কমিটি, ক্যাবিনেট ও দলব্যবস্থার পুনর্গঠনে নজর দেন। পার্লামেন্টকে যাতে আরও দায়িত্বশীল প্রতিষ্ঠান করে তোলা যায় সেই উদ্দেশ্য নিয়ে তিনি কমিটি ব্যবস্থা, পার্লামেন্টের নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা,

---

১. ভারতের জাতীয়তাবাদ শান্তিবাদ, উদারবাদ, যুক্তিবাদের সার্বিক মূল্যকে স্বীকার করলেও নেহরু চান ভারতের জাতীয়তাবাদ হোক ধর্মনিরপেক্ষ, বিজ্ঞানধর্মী, গঠনমূলক। R. C. Pillai তাঁর 'Political Thought of Jawaharlal Nehru' রচনায় লিখেছেন "What he demanded was the introduction of a secular, rational and scientific, international outlook as the essential ingredients of Indian nationalism." Pillai, in Pantham and Deutsch, Political Thought in Modern India, p. 261

২. Bhikhu Parekh, Jawaharlal Nehru and the crisis of Modernization, M. Upendra Baxi and Bhikhu Parekh (eds.) crisis and change in contemporary India

বিরোধী দলের মর্যাদা এসব প্রশ্নে গুরুত্ব দেন। নীতি নির্ধারণে, জনমত গঠনে পার্লামেন্ট যাতে শক্তিশালী মঞ্চ হিসাবে গড়ে উঠতে পারে সেকথা তিনি ভেবেছেন। ক্যাবিনেট ব্যবস্থাকেও তিনি শক্তিশালী ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। ক্যাবিনেটে বিরোধী দলের সুযোগ্য নেতাদের স্থান দিয়ে তিনি এক অভূতপূর্ব দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। **কংগ্রেস দলকে প্রচলিত বা রীতিগত এক রাজনৈতিক দল হিসাবে তিনি দেখতে চান নি। তিনি চেয়েছিলেন কংগ্রেস হয়ে উঠুক এক জাতীয় মঞ্চ, যার শুধু রাজনৈতিক লক্ষ্যই থাকবে না, থাকবে জাতি গঠনের নৈতিক আদর্শ।** দলের মধ্যে মতাদর্শগত কঠোরতা নয়, তিনি চেয়েছেন গণতান্ত্রিক পরিবেশ। অন্যান্য দলের মতামত, পরামর্শকে তিনি আহ্বান করেছেন। **তিনি চেয়েছেন দল হয়ে উঠুক আন্দোলনের এক মঞ্চ।** সম্ভবত এই কারণেই দলের সাংগঠনিক প্রশ্নটি তাঁর আমলে অবহেলিত হয়েছিল। নেহরুর আমলে দলের মন্ত্রী ও পার্লামেন্টীয় গোষ্ঠী যতটা প্রাধান্য পেয়েছে দলের বিভিন্ন স্তরের সংগঠন তেমন গুরুত্ব পায়নি। গান্ধী চেয়েছিলেন কংগ্রেসের সাংগঠনিক দিক শক্তিশালী হোক, সরকার নয়; নেহরুর ভুল তিনি দলের সরকারী গোষ্ঠীকেই শক্তিশালী করতে চেয়েছেন সংগঠনের মূল্যে। এর ফলে দলের মতাদর্শগত অবস্থান, সাংগঠনিক ঐক্য ও সংহতির প্রশ্নে সমস্যা দেখা দিয়েছে। **নেহরু ভারত রাষ্ট্রের বৃহত্তর স্বার্থে, রাষ্ট্রের কাজে দলকে তেমনভাবে ব্যবহার করতে পারেন নি বলে নির্ভর করেছেন আমলাতন্ত্রের উপর। নেহরুর সময় আমলাতন্ত্র এক পেশাদারী, সংগঠিত কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রিক সংস্থা হিসাবে গড়ে উঠেছে।** নেহরু যে আমলাতন্ত্রের গুণ, যোগ্যতা ও দায়িত্বশীলতায় অতিরিক্ত আশাবাদী ছিলেন, তাঁর সময়ে আমলাতন্ত্র যে ব্রিটিশ আমলাতান্ত্রিক বিন্যাস ও ভাবনা নিয়েই গড়ে উঠেছিল, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের কল্যাণব্রতী, সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের ভারতীয় রাষ্ট্রব্যবস্থার সঙ্গে এই আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থা যে বেমানান—সমালোচকেরা এসব প্রশ্ন তোলেন। ঔপনিবেশিক ধাঁচের আমলাতন্ত্র যে এদেশের পক্ষে উপযোগী নয়, আমলাতন্ত্রের মৌলিক ও গণতান্ত্রিক পরিবর্তন যে প্রয়োজন একথা জেনেও নেহরু কিন্তু ভারতরাষ্ট্রের আমলাতান্ত্রিক প্রবণতাকে প্রতিরোধ করতে পারেন নি।[১]

রাষ্ট্র, আইন, সংবিধান, গণতন্ত্র সম্পর্কে নেহরুর সংগঠিত ভাবনা ছিল। মনে-প্রাণে সমাজতান্ত্রিক হলেও, তিনি ছিলেন রাষ্ট্রবাদী। রাষ্ট্র, আইন, সংবিধান সম্পর্কে গান্ধীর নেতিবাচক ভাবনায় তাঁর সমর্থন ছিল না। ব্রাসেলসে বা তিরিশের দশকে নেহরু রাষ্ট্র সম্পর্কে যে ভাবনাকে প্রকাশ করেছেন, রাষ্ট্রের শ্রেণীচরিত্র বা সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র সম্পর্কে যা ভেবেছেন স্বাধীন ভারতরাষ্ট্রের রূপকার হিসাবে রাষ্ট্র সম্পর্কে সে ভাবনা তাঁর ছিল না। ১৯২৮ সালে নেহরুর ভাবনা ছিল রাষ্ট্র শাসকশ্রেণীর যন্ত্র, ধনী আর সুবিধাবাদীরাই রাষ্ট্রযন্ত্রকে করায়ত্ত করে রেখেছে, বুর্জোয়া রাষ্ট্রে স্বাধীনতা, সাম্য, মৈত্রীর ধারণা মূল্যহীন। তিনি একথাও বলেছেন রাশিয়াই একমাত্র এই ব্যবস্থার পরিবর্তন এনেছে। এখানে রাষ্ট্র হয়ে উঠেছে মেহনতি মানুষের রাষ্ট্র। সোভিয়েত রাষ্ট্রের প্রতি তাঁর কোন অপছন্দ ছিল না, সোভিয়েত দেশে প্রতিষ্ঠিত প্রলেতারীয় একনায়কত্বকে তিনি অন্যান্য একনায়কত্বের সঙ্গে মেলাতে চান নি। এই রাষ্ট্র যে শ্রমিকের ইচ্ছাকে গুরুত্ব দেয়, এখানে যে শোষণ নেই তাঁর 'Glimpses of World History' -তে তিনি একথা বলেছেন।

---

১. বিস্তৃত আলোচনার জন্য, Bhikhu Parekh-এর রচনা দ্রষ্টব্য।

তবে পরবর্তী সময়ে তিনি যে তাঁর শ্রেণী ধারণাকে সামনে রেখে রাষ্ট্রকে বিচার করেছেন তা নয়। তিনি ঐ একই রচনায় বলেছেন একটি সুসংগঠিত স্বাধীন রাষ্ট্রে রাষ্ট্রই হল জনগণ। বুর্জোয়া রাষ্ট্র যে ক্রমশঃ কল্যাণব্রতী রাষ্ট্রে পরিণত হচ্ছে এ প্রবণতা তিনি লক্ষ্য করেছেন। গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের সূত্রে সমাজে যে পরিবর্তন আসছে, পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের রূপ আগের মত নেই একথা তিনি তাঁর পরবর্তীকালের চিন্তায় প্রকাশ করেছেন। তবে ভারত রাষ্ট্রকে যে একটি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে পরিণত করার ইচ্ছা তাঁর আছে, এ ভাবনাকে তিনি গোপন করেন নি। স্বাধীন ভারতের প্রধানমন্ত্রী হিসাবে তিনি অবশ্য গণতান্ত্রিক ভারত রাষ্ট্র, তার আইন, সংবিধান, পার্লামেন্ট এসব নিয়েই ভেবেছেন বেশী। **স্বাধীন ভারত রাষ্ট্রকে নেহরু বুর্জোয়া রাষ্ট্র হিসাবে ভাবেন নি, ভেবেছেন ভারতীয় সমাজের প্রধান প্রধান শ্রেণীর ঐক্য ও সহযোগিতার ভিত্তিতে গঠিত এক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসাবে। তাঁর চোখে ভারত সরকার সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসাধারণের জনপ্রিয় সরকার।** যে কংগ্রেস সংগঠনকে স্বাধীনতার আগে বুর্জোয়া সংগঠনের অধিক কিছু ভাবেন নি সেই কংগ্রেস যখন শাসক দল হিসাবে ভারত রাষ্ট্র পরিচালনা করছে তখন তার উপর তিনি 'বুর্জোয়া' শব্দ প্রয়োগ করেন না।

গান্ধীর নৈতিক ও মানবিক ভাবনায় প্রভাবিত হলেও, গান্ধীর নৈরাজ্যবাদী ভাবনা নেহরুকে স্পর্শ করে না। ক্ষমতা যে দুর্নীতির সূত্র গান্ধীর এই ভাবনায় তিনি আলোকিত নন। ব্যক্তি ও সমাজের বিরোধ বা ব্যক্তির স্বাধীনতা সম্পর্কে তিনি তেমন সোচ্চার নন। আধুনিক সভ্যতা আর ক্ষমতার কেন্দ্রীভবনের জালে ব্যক্তি স্বাধীনতা যে বন্দী তার এই পূর্ব বিশ্বাস স্বাধীন ভারতে আর নেই। বিকেন্দ্রীকরণের কথা বললেও তিনি শক্তিশালী রাষ্ট্রযন্ত্র আর রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের ধারণাকেই গুরুত্ব দেন। ব্রিটিশ প্রশাসনিক যন্ত্রকে ধ্বংস করার যে ডাক তিনি স্বাধীনতা-পূর্ব সময়ে দিয়েছেন তাকে মিথ্যা প্রমাণিত করে স্বাধীন ভারতে আমলাতান্ত্রিক রাষ্ট্রের এক শক্ত ভিত প্রতিষ্ঠিত করেছেন। ক্ষমতায় এসে তিনি চীন বা রাশিয়ার ধারাকে অনুসরণ করেন নি, ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র কাঠামো বা প্রশাসনকে ধ্বংস করে নতুন রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে তোলেন নি। ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র, সংবিধান, আইন, আমলাতন্ত্রকেই তিনি গ্রহণ করেছেন। পরবর্তী সময়ে অবশ্য এই পুরোনো রাষ্ট্র ব্যবস্থা, সরকারী যন্ত্র, সংবিধান, অর্থনীতি সম্পর্কে তিনি তাঁর ভাবনার অনেকটাই পরিবর্তন ঘটান। রাষ্ট্রযন্ত্রকে তৃণমূল স্তরে নেবার, আরও গণতান্ত্রিক রূপ দেবার ইচ্ছা তিনি প্রকাশ করেন। ভারত-রাষ্ট্রের আইন ও সংবিধানকে আরও ধর্মনিরপেক্ষ, আধুনিক করার ইচ্ছা তিনি ব্যক্ত করেন।

ঘ. নেহরুর গণতান্ত্রিক ভাবনা

গণতন্ত্র সম্পর্কে নেহরুর ভাবনা ছিল স্পষ্ট, তবে ভারত রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে এই উপলব্ধিকে তিনি সবক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে চান নি বা পারেন নি। সম্পূর্ণ স্বাধীনতার ভাবনার পরিপূরক হিসাবেই গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের এক ভাবনাকে তিনি পোষণ করেছেন। **দমন পীড়নের যন্ত্র রাষ্ট্রের চেয়ে জনগণের সম্মতিযুক্ত রাষ্ট্রেই যে তাঁর অধিক আগ্রহ ১৯৩০ সালেই এ মত তিনি ব্যক্ত করেছেন। পরবর্তীকালে তিনি বলেছেন স্বৈরতান্ত্রিক পথ নয় গণতন্ত্রের পথই তাঁর পছন্দ, কারণ এটিই লক্ষ্যে পৌছবার সঠিক পন্থা, শান্তিপূর্ণ পদ্ধতি।** ভারতবর্ষকে 'largest functioning democracy in the world' ভেবে তিনি গর্বিত এবং এর কোন রকম বিচ্যুতি বা বিকৃতি যে

প্রগতির পথকে রুদ্ধ করবে তাতে তাঁর কোন সন্দেহ নেই। ১৯২০ ও ১৯৩০ -এর দশকেই গণতন্ত্র সম্পর্কে এক ঐতিহাসিক শ্রেণী দৃষ্টিভংগি তাঁর ছিল, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রও যে শ্রেণী রাষ্ট্র একথা তিনি স্বীকার করেছেন তবে ভারতরাষ্ট্রের বাস্তব অবস্থায় গণতন্ত্রই যে তাঁর লক্ষ্য, এর সীমার নিচে যে কোন অবস্থাই তাঁর কাম্য নয় একথা তিনি বলেছেন। ১৯৪৬ সালে গণতন্ত্র যে প্রগতির পথে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিচ্ছে ইউরোপের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের দিকে চেয়ে তিনি একথা বলেন। ভারতবর্ষে তিনি এমন সরকারই চান যা দেশের মানুষের কাছে গ্রাহ্য হবে, তাদের মানসিকতার উপযুক্ত হবে। পার্লামেন্টীয় গণতন্ত্র, নির্বাচন, সার্বজনীন ভোটাধিকার এসবই দেশের মানসিকতার সঙ্গে মানানসই, ভাল ফল আনবে বলে তিনি মনে করেছেন।

১৯২০ বা ১৯৩০ -এর দশকে নেহরু বুর্জোয়া গণতন্ত্রের কঠোর সমালোচক হলেও ১৯৫০ বা তার পরবর্তীকালে সেই কঠোরতা তাঁর ছিল না। এই সময় গণতন্ত্রের সঙ্গে পুঁজি, সম্পত্তি, সামরিকবাহিনী, আমলা বা বুর্জোয়া প্রচারযন্ত্রের বন্ধুত্বের কথা তিনি বলেন না। তিনি এই যুগে গণতন্ত্রের মধ্যে দেখেন প্রগতিশীল শক্তি—পার্লামেন্ট, সংবিধান, ভোটাধিকার সব কিছুই প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক ভাবনার অঙ্গ। রাজনৈতিক গণতন্ত্রের সীমা অতিক্রম করে গণতন্ত্র যে প্রসারিত হবে সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে, এ আশা তিনি প্রকাশ করেন। জনকল্যাণ, সুযোগের সমতা, সমাজতান্ত্রিক সমাজের ভাবনা গণতন্ত্রের প্রসারে সাহায্য করবে বলেই তিনি মনে করেন। গণতন্ত্রের সাফল্যের শর্ত হিসাবে তিনি নির্বাচিত পার্লামেন্ট, আলাপ-আলোচনা, জনমত, সংখ্যাগরিষ্ঠের সরকার সব কিছুকেই বোঝেন। দমন পীড়ন নয়, জনগণের সদিচ্ছা, সহযোগিতা—গণতন্ত্রের সাফল্যের সূচক। সংখ্যাগরিষ্ঠ ও সংখ্যালঘিষ্ঠের বোঝাপড়াকে তিনি স্বাগত জানান। শান্তিপূর্ণ পদ্ধতিতে সমস্যার সমাধানই গণতান্ত্রিক প্রগতির লক্ষণ বলে তিনি মনে করেন। গণতন্ত্রের ভাবনাকে প্রসারিত করতে জনশিক্ষা, নাগরিক চেতনা প্রসারের কথা বলেন তিনি। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, বাক্ স্বাধীনতা গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার ভিতকে শক্ত করে।

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সমস্যা নিয়েও নেহরু ভেবেছেন। কাজের জটিলতা ও চাপ, সমন্বয়ের অভাব, দায়িত্বের অভাব, ক্ষমতার অপব্যবহার গণতন্ত্রের সমস্যা। ক্ষমতার কেন্দ্রীভবন বুর্জোয়া পার্লামেন্টীয় ব্যবস্থার ক্ষতিকর প্রবণতা একথা ১৯৩০ -এর দশকে বললেও পরে নেহরু তেমনভাবে বলেন না। তবে গণতন্ত্রের বর্তমান সময়ের সমস্যাকে যে বিগত শতাব্দীর দৃষ্টি দিয়ে দেখলে চলবে না, একথা তিনি স্মরণ করিয়ে দেন। নেহরু গণতন্ত্রের পথে বিরাট উল্লম্ফনের জন্য গণতান্ত্রিক শিক্ষার প্রসারের কথা বলেন। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে গণতন্ত্রের সাফল্যের মূল শর্ত হল শান্তি ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধকে গ্রহণ করার মানসিকতা। মানবিক অধিকার, জনগণের রাজনৈতিক-সামাজিক-অর্থনৈতিক অধিকারের সম্প্রসারণ ইত্যাদির সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রব্যবস্থাকে আরো পরিপূর্ণ, সুদৃঢ় করা, আইনের শাসন, সাংবিধানিক ব্যবস্থাকে সংগঠিত করা, নাগরিক অধিকারের সঙ্গে কর্তব্য, রাষ্ট্রের ঐক্য ও সংহতির দিকে নজর দেবার কথা বলেন নেহরু। ভারতীয় সংবিধানের 'objective resolutions' -এর উপর নেহরুর বিশ্বাস, সংবিধানের এই প্রস্তাবকে কার্যকর করার জন্য তাঁর সংকল্প ভারতীয় গণতন্ত্রের প্রতি তাঁর গভীর বিশ্বাস ও আস্থাকে প্রকাশ করে।

৬. নেহরুর সমাজতান্ত্রিক চিন্তা

নেহরুর রাষ্ট্রচিন্তার একটি তাৎপর্যপূর্ণ দিক হল তাঁর সমাজতান্ত্রিক চিন্তা। অমৃতসর কংগ্রেসে (১৯১৯) গান্ধীজির আবেদন ছিল কংগ্রেস এমন কর্মসূচী গ্রহণ করুক যার আবেদন হবে জনমুখী। অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের মধ্য দিয়ে জাতীয় আন্দোলন পেল একটি জনমুখী ভিত্তি। আন্দোলনের এই জনমুখী ভিত্তিকে আরও সুদৃঢ় করতে ১৯২৭ সালের পরবর্তীকালের সময় থেকে জাতীয় আন্দোলনের ভাবনাকে প্রসারিত করার এক সুনিষ্ঠ প্রয়াস লক্ষ্য করা গেল কংগ্রেসের তরুণ নেতা জওহরলালের মধ্যে। জওহরলাল নেহরু চাইলেন জনসাধারণের আস্থা আর আনুগত্যের প্রতি পূর্ণ মর্যাদা দিয়ে অর্থনৈতিক পুনর্জাগরণের নতুন দায়িত্বকে সফল করার কাজে এগিয়ে আসুক কংগ্রেস। দারিদ্র্য, দুঃখ, অস্বাস্থ্য, অপুষ্টির সমস্যার দিকে নজর না দিলে পূর্ণ স্বাধীনতার আন্দোলন সাফল্য পেতে পারে না এই ভাবনাকে গুরুত্ব দিয়েই লাহোর কংগ্রেসে (১৯২৯) নব-নির্বাচিত কংগ্রেস সভাপতি নেহরু ডাক দিলেন পূর্ণ স্বাধীনতার। কংগ্রেসের মঞ্চে সর্বপ্রথম তিনি ব্যবহার করলেন সমাজতন্ত্রের ভাবনা। কংগ্রেসের করাচী অধিবেশনে (১৯৩১) অর্থনৈতিক স্বাধীনতার ধারণা গুরুত্ব পেল। জাতীয় আন্দোলনকে সমাজতন্ত্রের গতিতে অগ্রসর করার কথা বলা হল। লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসের (১৯৩৬) মঞ্চে জওহরলাল যে ঐতিহাসিক ঘোষণা ও প্রস্তাবের কথা ব্যক্ত করলেন তার আবেদন অসাধারণ। জওহরলাল নেহরু জানালেন আজ থেকে ১৬ বছর আগে গান্ধীজির নেতৃত্বে কংগ্রেস যে শক্তি, গণতান্ত্রিক সংগঠন হিসাবে ভারতের মাটিতে এবং ভারতের জনগণের মধ্যে নিজেকে মেলে ধরতে পেরেছিল আজ নতুন পরিস্থিতি, আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে তাকে প্রসারিত করার সময় এসেছে। সাম্রাজ্যবাদী ও ফ্যাসিবাদী চক্রের হাত থেকে জাতীয়তাবাদ ও সমাজতন্ত্রের এই আন্দোলনকে শক্তিশালী করতে হবে। বিশ্ব প্রগতিবাদী আন্দোলনের সঙ্গে ভারতের জাতীয় আন্দোলনকে যুক্ত করার আহ্বান জানালেন জওহরলাল। জওহরলাল জানালেন বিশ্বের সমস্যা ও ভারতের সমস্যা সমাধানের চাবিকাঠীটি হল সমাজতন্ত্র। সমাজতন্ত্র ছাড়া দেশের মানুষের দারিদ্র্য, বেকারত্ব, অধঃপতন এবং পরাধীনতার হাত থেকে মুক্তি নেই। সমাজতন্ত্র হল নতুন সভ্যতা, 'a vital creed' যাকে হৃদয় ও মস্তিষ্ক দিয়ে তিনি তুলে ধরতে চান।

সমাজতন্ত্রের বিজ্ঞাননির্ভর ভাবনাকে মনে-প্রাণে গ্রহণ করলেও, ভারতের মাটিতে এই বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের ধারাকে তিনি প্রতিষ্ঠা করতে সফল হন নি। তবে সমাজতন্ত্রের পথে ভারতকে সংগঠিত করতে তাঁর চেষ্টার ত্রুটি ছিল না। ১৯২৭ থেকে ১৯৩৯ —এই সময়কালে বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের সঙ্গে, সাম্রাজ্যবাদ ও ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে ভারতের আন্দোলনকে যুক্ত করতে চাইলেও, রাশিয়ার বিপ্লব, সোভিয়েত নব সমাজতান্ত্রিক সভ্যতাকে স্বাগত জানালেও, স্বাধীনতালাভের পরবর্তীকালে ভারতের প্রধানমন্ত্রী হিসাবে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের ধারায় ভারতের জাতি গঠন ও আধুনিকীকরণের ভাবনাকে তিনি রূপ দিতে পারে নি। তবে জওহরলালের কাজ থেমে থাকেনি। কংগ্রেসের মধ্যে প্রাচীন, রক্ষণশীল গোষ্ঠী প্রতিরোধ ভেঙে, নেহরুর উদ্যোগ ও উৎসাহে গৃহীত হল পরিকল্পিত পথে উন্নয়নের ধারণ

বিদ্যমান সমাজ বিন্যাসকে বজায় রেখে ব্যাপক রূপান্তর ও নির্মাণের কর্মসূচী নিলেন নেহরু। পরিকল্পনা কমিশন গঠিত হল, ধার্য হল পরিকল্পিত পথে অর্থনৈতিক উন্নতির লক্ষ্য, রাষ্ট্র পরিচালনার নির্দেশমূলক নীতিকে সামনে রেখে ব্যক্ত হল পরিকল্পনার মাধ্যমে অর্থনৈতিক ও সামাজিক সংস্কার অর্জনের ইচ্ছা। কৃষি, গ্রামীণ উন্নয়ন, সেচশক্তি অগ্রাধিকার পেল পরিকল্পনায়। জাতীয় উন্নয়ন পর্ষদের সভায় (নভেম্বর, ১৯৫৪), লোকসভায় বক্তৃতায় (ডিসেম্বর, ১৯৫৪) নেহরু সমাজতান্ত্রিক সমাজ গড়ার এক লক্ষ্য পেশ করেছেন। আবাদী প্রস্তাবে 'সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের সমাজ' গড়ার ভাবনাকে গ্রহণ করা হয়েছে। কংগ্রেসের জয়পুর অধিবেশন (১৯৬৩) ও ভুবনেশ্বরের অধিবেশনে (১৯৬৪) ভারতের সমাজতান্ত্রিক লক্ষ্য, সমাজতান্ত্রিক সমাজের আদর্শকে ব্যক্ত করে নেহরু প্রমাণ করেছেন সমাজতন্ত্রের প্রতি তাঁর আস্থা কত দৃঢ়। যদিও গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রের শান্তিপূর্ণ ভাবনাতেই আস্থা প্রকাশ করা হয়েছে নেহরুর সমাজবাদী ভাবনার প্রতি আনুগত্য এর ফলে ছোট হয় না। পরিস্থিতির চাপে পদ্ধতি পাল্টালেও সমাজতন্ত্রের পথেই যে ভারতের উন্নয়নকে অগ্রসর করতে হবে তাতে জওহরলালের বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না।

R. C. Pillai বলেছেন, 'Nehru was quite sincere and earnest in his effort to develop an Indian model of planning and development.'[১] দ্বিধা-দ্বন্দ্ব থাকলেও জওহরলালের সমাজতান্ত্রিক চিন্তার মধ্যে ছল বা চাতুরী ছিল না (nothing evasive), উদাসীন কোন মনোভাব ছিল না বলে অধ্যাপক হীরেন মুখোপাধ্যায় মনে করেন।[২] নেহরুকে জাতীয় বুর্জোয়ার প্রতিনিধি বলে মেনে নিতে মোহিত সেনের মত পণ্ডিতের আপত্তি ছিল। ভারতে পুঁজিবাদ যে অচল, এই ব্যবস্থা যে গ্রহণযোগ্য নয় নেহরু দৃঢ়তার সঙ্গেই একথা বলেছেন। সমাজতন্ত্র ও প্রগতির প্রতি নেহরুর আকর্ষণ প্রশংসা পেয়েছে মার্কসীয় তাত্ত্বিক উলিয়ানভস্কির ভাষ্যে। উলিয়ানভস্কির কথায় "Looking at all the facets of Nehru's work as a political and public figure, as a philosopher and historian, it should be stressed that all that is best in his legacy—and we are deeply convinced of this—was due to his attraction to socialism and progress, and his interest in scientific socialist theory, which considerably influenced his world outlook and politics."[৩] নরহরি কবিরাজ নেহরুর সমাজতন্ত্রের মধ্যে দেখেছেন একজন 'Enlightened Nationalist'কে। নেহরুর জীবনীকার গোপাল বলেছেন নেহরুর অর্থনৈতিক পরিকল্পনার লক্ষ্য ছিল 'to build a socialist economy within a democratic structure.' এই সমস্ত মন্তব্য প্রমাণ করে নেহরুর দৃঢ় সমাজবাদী আনুগত্য।

---

১. R. C. Pillai, The Political Thought of Jawaharlal Nehru, in Pantham and Deutsch, p 269

২. Hiren Mukherjee, The Gentle colossus

৩. Ulyanovsky, Jawaharlal Nehru, Present day Problems in Asia and Africa, in Narahari Kaviraj, Gandhi-Nehru through Marxist'Eyes, p 52

৪. ঐ, p 53

নেহরুর সমালোচকেরা অবশ্য তাঁর জাতিগঠন ও সমাজগঠনের ভাবনা ও সমাজতান্ত্রিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে একেবারেই উদাসীন। নেহরুর প্রধানমন্ত্রিত্বের কালে 'সমাজতন্ত্র' কথাটিই তাঁর রাজনীতি থেকে হারিয়ে গিয়েছিল বলে তাঁদের ধারণা। ভারতের সংবিধানে সমাজতন্ত্র কথাটিকে তিনি তেমনভাবে ব্যবহার করেন নি। তাঁর মিশ্র অর্থনীতির ধারণায় সমাজতন্ত্র নয়, আছে গণতান্ত্রিক সংস্কারবাদের ধারণা। তিরিশের দশকের বিপ্লবী সমাজতন্ত্রী নেহরু নতুন যুগে বিপ্লবী চেতনা নিয়ে নয়, সমাজ পরিবর্তনের আমূল বৈপ্লবিক ভাবনা নিয়ে নয়, ধীর গতিতে, বোঝাপড়া ও আপোসের পথেই সমাজসংস্কারের কথা ভাবেন। তবে শেষ বিচারে তাঁর চিন্তা বা কাজ ইতিবাচকই ছিল। সমাজতন্ত্রকে অর্জন করতে না পারলেও, ভারতের মৌল সমস্যার সমাধানে আধুনিক মন নিয়েই, সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী মানসিকতা নিয়েই তিনি অগ্রসর হয়েছেন। শান্তি, সহাবস্থান, মানবতার লক্ষ্যে এক সমৃদ্ধ, প্রগতিশীল ভারত গড়ার আন্তরিক ইচ্ছা ও প্রয়াস তাঁর সবসময়ই ছিল।

৮. নেহরুর আন্তর্জাতিক আদর্শ ও বিদেশ নীতি

নেহরুর সবচেয়ে বড় পরিচয় তিনি ছিলেন মানুষের লোক, মানবতার প্রতিমূর্তি। আন্তর্জাতিক সম্পর্কের গবেষকদের দৃষ্টিতে নেহরু হলেন 'one of the creators of modern international relations.' নতুন স্বাধীনতা পাওয়া দেশগুলির কাছে তিনি ছিলেন উৎসাহ ও তৎপরতার প্রতীক। সাম্রাজ্যবাদের নিপীড়নে রুদ্ধ এই দেশগুলিকে তিনি দেখিয়েছেন সংগ্রামের, সহযোগিতার, গঠনের পথ। সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী আন্দোলন, আফ্রো-এশিয়ান জোট, নবগঠিত রাষ্ট্রের উন্নয়ন, আন্তর্জাতিক শান্তি, মানবিক অধিকারের জন্য আজীবন নিজেকে উৎসর্গ করেছেন নেহরু। শুধু দেশের সমস্যা নয়, তাকে সমানভাবে পীড়িত করেছে আন্তর্জাতিক সমস্যা ও সংকট, মানবতার সংকট। ১৯২০ সাল থেকেই ভারতের জাতীয় কংগ্রেসকে আন্তর্জাতিক সমস্যা ও সংহতির প্রশ্নে জাগ্রত করতে চেয়েছেন তিনি। জাতীয় ক্ষমতা, জাতীয় স্বার্থ, দ্বি-মেরুবাদ, ক্ষমতার ভারসাম্য, ঠাণ্ডা লড়াই এসবের মধ্যে যে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের মূল ভাবনা নিহিত নয়, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক যে এর চেয়ে অনেক বড়, মহান এক আদর্শ একথা তিনি প্রচার করেছেন। ভবিষ্যৎ ভারতের আন্তর্জাতিক সম্পর্কের দৃষ্টি কী হবে, বিদেশ নীতি কোন পথে চলবে আগে থেকেই তার গতি নির্ধারণ করতে চেয়েছেন তিনি। বিশ্ব সমাজ, আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা, আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ও মানবিক অধিকারের ভারতীয় আদর্শ ও বার্তা তিনি বহন করেছেন বিশ্বের মানুষের কাছে। নেহরু শুধু ভারতপ্রেমিক নন, বিশ্বপ্রেমিক। যুদ্ধ, শান্তি, নিরস্ত্রীকরণের প্রশ্ন নিয়ে তিনি গভীরভাবে ভেবেছেন একথা ঠিক, কিন্তু তাঁর ভাবনায় অগ্রাধিকার পেয়েছে নিপীড়িত জাতির স্বাধীনতার সমস্যা, জাতি বিরোধের সমস্যা, বিশ্বের এক বিরাট এলাকা জুড়ে দারিদ্র্য, রোগ, অজ্ঞতার সমস্যা। বিশ্বকে 'Integrated entity' হিসাবেই তিনি ভেবেছেন। তাই বিশ্ব শান্তি, সহাবস্থান, বিশ্ব মানবতার সমস্যাই তাঁকে স্পর্শ করে যায়। চিরস্থায়ী শান্তির ভাবনায় তিনি প্রচার করেন বিশ্ব সংগঠনের তত্ত্ব।